PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-REFERRED-BI-ANNUAL DIGITAL RESEARCH JOURNAL
Website: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG.IN
VOLUME-1 ISSUE-1 JULY 2022

দেশসেবা ও সাহিত্যসেবায় বিপিনচন্দ্র পাল

অপরেশ হালদার

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wpcontent/uploads/2022/12/bipinchandra-pal-1.pdf

সারসংক্ষেপ: সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্র পালের সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে দেশের কল্যাণচিন্তা কীভাবে সংমিশ্রিত ছিল তার বিশ্লেষণই এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। লেখকের বিভিন্ন প্রবন্ধ অবলম্বনে সাহিত্য আদর্শ বিস্তারিত আকারে আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: পরাধীন ভারতবর্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাহিত্যসেবা, দেশসেবা, জাতীয়তাবাদ, চরমপন্থা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পরাধীন ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় যে কয়েক জন স্বদেশপ্রাণ যুবকের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)। অসাধারণ বাগ্মী, যুক্তিনিষ্ঠ এই মানুষটির কর্মজীবনের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হলো সাংবাদিকতা, সাহিত্য সেবা ও দেশ সেবা। বস্তুত পূর্বোক্ত তিনটি ক্ষেত্র তাঁর জীবনে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়েছিল যে সেগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা দুষ্কর। জীবনের প্রথম থেকে যে পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন তাতে নিরন্তর সাহিত্য রচনার সুযোগ তাঁর আসেনি। বরং বিচ্ছিন্নভাবে জীবনের বিভিন্ন সময়ে কলম ধরেছেন। এবং সুনিপুণ হস্তে সাহিত্যভাবনার সঙ্গে দেশকল্যাণকামী চিন্তা চেতনাকে সংমিশ্রিত করেছেন।

সাংবাদিকতা তাঁর কর্মজীবনের অন্যতম ক্ষেত্র। জীবনের বিভিন্ন পর্বে অসংখ্য সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেছেন। আবার সম্পাদক না হলেও একাধিক সাময়িক পত্র পরিচালনার দায়িত্ব তিনি অকাতরে গ্রহণ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি সম্পাদনা করেছেন 'New India' (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ), 'বন্দেমাতরম' (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ), 'পরিদর্শক'(১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ), 'সোনার বাংলা'(১৩৩২-১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), 'Swaraj' (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ), 'Independent'এর (১৯২০ খ্রিস্টাব্দ) মতো একাধিক পত্র-পত্রিকার। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সম্পাদনায় নাম না থাকলেও একাধিক পত্রিকা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিপিনচন্দ্রের। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেশবন্ধু সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনায় তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ্য। স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা এবং বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল 'নারায়ণে'র প্রধান প্রাবন্ধিক। অসংখ্য বাংলা, ইংরেজি গ্রন্থের প্রণেতা বিপিনচন্দ্র এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। এমন অভিজ্ঞ সু-সম্পাদক বিপিনচন্দ্র 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশের বিবিধ পরিকল্পনা, লেখা সংগ্রহ থেকে যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সাময়িক পত্রে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বদেশী আবেগ, উত্তেজনা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদক বিপিনচন্দ্র তুলনাহীন।

বাংলা সাহিত্যে বিপিনচন্দ্রের কৃতিত্ব মূলত প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর প্রবন্ধগুলি কখনো ধর্ম সম্বন্ধীয়, কখনো সমাজকেন্দ্রিক, কখনো বা স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা উদ্দীপ্ত। সমাজ বিষয়ক রচনাগুলিতে হিন্দু সমাজকে সংহত করার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আমরা লক্ষ করব। সংখ্যার বিচারে সমাজ-সচেতনতামূলক প্রবন্ধই তিনি বেশি রচনা করেছেন। সমকালীন ভারতবর্ষ বিদেশী শক্তির কাছে পরাধীন। সেসময় ভারতবর্ষের সর্বস্তরে ঔপনিবেশিক মানসিকতা ক্রমশ প্রতিফলিত হচ্ছিল। বিপিনচন্দ্র এই প্রবণতার নানা ভাবে বিরোধিতা করেছেন। ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রতি দেশবাসীর আস্থা পুনরুদ্ধার তাঁর অন্যতম অভিপ্রায়।

এই শ্রেণির প্রবন্ধে মূলত যে বিষয়গুলি প্রাবন্ধিকের আলোচনার কেন্দ্রবস্তু হয়ে উঠেছে সেগুলি হলো —

ক. বিশ শতকীয় হিন্দু সমাজ-সভ্যতার সমালোচনা

খ. প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন

গ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে ইউরোপীয় জীবনযাত্রার সমালোচনা

ঘ. ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় পাশ্চাত্য প্রভাব বর্জনপূর্বক আদর্শ সমাজ গঠনের আহ্বান

ঙ. স্বদেশ উদ্ধারের আহ্বান

বিংশ শতাব্দীর আদর্শভ্রষ্ট ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে নানাভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। জাতপাতের মতো হীন প্রথাগুলি পরাধীন জাতিকে কীভাবে পিছিয়ে দিচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যাবে এই সব রচনায়। একইসঙ্গে ভারতবর্ষের চিরায়ত সভ্যতার উপর বিদেশী সভ্যতার ক্ষতিকর প্রভাবটিও প্রাবন্ধিক বিপিনচন্দ্রের অগোচর থাকেনি।

'জাতি বা বর্ণভেদের কথা'র মতো রচনায় মূলত ভারতবর্ষীয় সমাজের নানা কুসংস্কার, অর্থহীন আচারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত রচনায় হিন্দু সমাজে জাতিভেদ সৃষ্টির কারণগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনায় আগ্রহী প্রাবন্ধিক বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁর স্পষ্ট অভিমত, জাতিভেদ কোন সনাতন ব্যবস্থা নয়। সমাজের প্রয়োজনেই বিভিন্ন বৃত্তিনির্ভর জাতিভেদ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। এই বৃত্তিনির্ভর জাতিভেদ ব্যবস্থা কীভাবে বংশগত ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে তা দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন প্রাবন্ধিক।

'নূতনে পুরাতনে' শীর্ষক রচনায় তৎকালীন বাঙালি জাতির সঙ্কটাপন্ন অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল। পশ্চিমী সভ্যতার আদর্শ কীভাবে বাঙালির নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে সে বিষয়ে পাঠকদের সচেতন করতে চেয়েছেন লেখক। সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের স্বদেশী সভ্যতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ভয়ঙ্কর প্রবণতার প্রতি তীক্ষ্ণ সমালোচনার সুর শোনা যাবে 'নূতনে পুরাতনে' শিরোনামযুক্ত রচনায়। প্রাবন্ধিক বিপিনচন্দ্রের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, ব্যক্তিজীবনে ইংরেজি শিখে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রতি প্রবল আকর্ষণবশত নিজেদের সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশী সভ্যতার মোহ, মায়ায় স্বদেশের সব বস্তুই একটা পর্বে হীন মনে হতো —

'ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া, একদিন আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম।... তখন আমাদের চক্ষে বিদেশের প্রায় সকলই ভাল লাগিত। আর স্বদেশের প্রায় সকলই স্বল্পবিস্তর মন্দ ঠেকিত।'[১]

'সকলি আছে কিছুই নাই' শীর্ষক রচনায় হিন্দু সমাজের প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার তুলনাসূত্রে প্রাচীন আদর্শ সম্পর্কে গৌরব অনুভব করেছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে, প্রাচীন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় উন্নত সমাজের সমস্ত আদর্শই নিহিত ছিল। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, উন্নত পন্থা, বহুবিধ সংস্কার ও অনুষ্ঠানের কোন কিছুই সেখানে অনুপস্থিত নয়। এই প্রবন্ধ থেকে প্রাবন্ধিক বিপিনচন্দ্র পালের আবেগবিহ্বল বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

‘হিন্দুর সকলই আছে, আবার কিছুই নাই। কথায় যাহা আছে কাজে তাহা নাই, অনুষ্ঠানে যাহা আছে, জ্ঞানেতে তাহা নাই, আদর্শে যতটা আছে বাস্তবে তার কিছুই নাই। এই জন্য হিন্দু বলিয়া আমরা যে গৌরব করি, তাহা সর্ব্বদা সত্য হয় না। তাই বলিয়া এই গৌরবটুকুও ত ছাড়তে পারিনা। এই গৌরবটুকুই যে এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। এই গৌরবটুকু আছে বলিয়াই ত আমরা আজও দুনিয়ার মাঝখানে যা হউক একটু আধটু মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি।’[২]

স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বরাজ্য আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে বহুকৌণিক বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষণীয় বিপিনচন্দ্র পাল রচিত ‘স্বরাজ কাহার রাজ? বা কোন রাজ?’ নামক রচনায়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলিতে স্বরাজ্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঠকসমাজকে সচেতন করার প্রয়াস লক্ষণীয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমকালীন চরমপন্থী অনেক জাতীয় নেতাই আস্থা রাখতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্র এবং সমকালীন চরমপন্থী নেতারা চেয়েছিলেন সহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। মনে রাখতে হবে, এই বিষয়টি নিয়ে মহাত্মা গান্ধী এবং চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মতান্তর ঘটে যায়। ফলে তিনি তাঁর বহু যত্নে লালিত ‘নারায়ণ’ পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কও ত্যাগ করেন। বস্তুত তাঁর সমস্ত প্রবন্ধে যে যুক্তি বিন্যাস লক্ষ করা যায় তা অনেকাংশেই স্বাদেশিক চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। সব মিলিয়ে প্রবন্ধ রচনায় বিপিনচন্দ্রের দেশ চেতনা ও সমাজ চেতনার আশ্চর্য স্ফুরণ লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মকথা ‘সত্তর বৎসর’ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে চাই —

‘আমার এই জীবনস্মৃতি বা আত্মচরিত যদি কেবল নিজের কথাই হইত, ইহাকে লোকসমাজে প্রচার করা সঙ্গত হইত না। আমার সত্তর বৎসরের জীবনকথা বাস্তবিক এই বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসেরই কথা।’[৩]

প্রবন্ধের পাশাপাশি কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বিপিনচন্দ্র সমাজ কল্যাণ-ভাবনা দ্বারা জড়িত। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের কাহিনিতে প্রতিফলিত অতি আধুনিক মানসিকতা বিপিনচন্দ্রের অনুমোদন পায়নি। তাই এই গল্পের প্রতিক্রিয়া সূত্রে তিনি লিখেছেন ‘মৃণালের কথা’ নামক ছোটগল্প। এই ধরনের একাধিক গল্প সে সময় ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই গল্প রচনার নেপথ্যে আছে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের সঙ্গে ‘নারায়ণ’এর লেখক-গোষ্ঠীর আদর্শগত বা দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা। বিভিন্ন মানবসম্পর্ক বিষয়ে বিপিনচন্দ্র বা ‘নারায়ণে’র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতার কারণেই সমকালীন সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাসে প্রতিফলিত সামাজিক সম্পর্কে আধুনিক মানসিকতা ‘নারায়ণ-গোষ্ঠী’ মেনে নিতে পারেনি। একাধিক গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলির অতি আধুনিক মানসিকতাকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে ‘নারায়ণে’র ছোটগল্পে।

তৎকালীন হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ জনিত কারণে সামাজিক সম্পর্কগুলিতে এক অতি আধুনিক মানসিকতার বহিঃস্ফুরণ ঘটছিল। হিন্দু সমাজেও দাম্পত্য বিচ্ছেদ বা ‘divorce’এর মতো ঘটনা প্রকাশ্যে আসছিল। সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্র হিন্দু সমাজের এই পতনকে ভালো চোখে দেখেন নি। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের প্রধান চরিত্র মৃণাল বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতাকামী কবি-কল্পনাপ্রিয় এক গৃহবধূ। সংসারে নারীর অপমান, লাঞ্ছনা সে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না। দূর সম্পর্কের আত্মীয় বিন্দুর দাম্পত্য সম্পর্কের অপমানে সে ক্রমশ দাম্পত্যে আস্থা হারায়। একইসঙ্গে মৃণাল তার স্বামীর ‘মেরুদণ্ডহীনতা’য় অতি বিচলিত হয়ে পড়ে এবং যার ফলে সে এক সময় হিন্দু সমাজের প্রথা ভেঙে স্বামীর থেকে দূরে গিয়ে একাকী জীবন কাটাতে চেয়েছে।

হিন্দু দাম্পত্যের প্রচলিত সংস্কারকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাওয়া এই আধুনিক নারীর প্রবল সমালোচনা করা হলো ‘মৃণালের কথা’ গল্পে। হিন্দু সমাজের প্রথা ভেঙে স্বামীকে ত্যাগ করে একাকী জীবন কাটাতে ইচ্ছুক সে। স্বামীর থেকে দূরে শ্রীক্ষেত্রে চলে আসার পর থেকেই শুরু হয় মৃণালের নিঃসহায় জীবন। এই পর্বে মৃণালের দেওর নরেন মৃণালকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে এইভাবে — **‘ত্যাগ করেছো কি করে ? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জান না।... মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে ইংরেজেরা তাকেই ডাইভোর্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।... স্বামীস্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না-, দিদি। যে দেশে মাজিস্টরের কাছে রেজিস্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মাজিস্টরের কাছে গিয়ে রেজিস্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ করতেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। জানো না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে হয়, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।’**[৪] গল্প থেকে উদ্ধৃত এই বক্তব্যটি নরেন চরিত্রের

হলেও আসলে বক্তব্যটি বিপিনচন্দ্রের রক্ষণশীল মতাদর্শপুষ্ট। এই গল্পে দেখানো হয়েছে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে মৃণাল লম্পট চরিত্রহীন এক পুরুষের চক্রান্তে পড়ে। অর্থাৎ হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্কই সব দিক থেকে নিরাপত্তা দিতে সমর্থ। তার বাইরে অন্যত্র হিন্দু নারী একাকী জীবন অতিবাহিত করতে পারে না — এই বিষয়গুলিই এ গল্পের প্রতিপাদ্য। বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতাকামী আধুনিক নারী 'ভুল' বুঝতে পেরেছে গল্পের শেষাংশে। মৃণালের লেখা অন্তত দুটি চিঠি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মৃণাল তার মেজো বৌদিকে চিঠিতে লিখেছে —

"আমাকে তোমার ওখানে যেতে বলছ, আমি কি করেছি তা জানলে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখতে চাইতে না! অমন দেবতার মতন স্বামী তাকে কতই না অনাদর, কতই না অপমান করেছি, শাস্ত্রমতে আমি পরিতক্তা কারণ অপ্রিয়ভাষিণী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে শাস্ত্রে এই কথাই বলে।"[৫]

আবার মৃণাল তার স্বামীকে লিখেছে — **"তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারই মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেই তো তোমায় এত অযত্ন এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি। পনর বছর কাল তোমার ঘর করলাম কিন্তু একদিনও তোমার পানে তাকাই নাই, কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অহংকারই করেছি, তোমার ওই বিশাল জ্ঞানের দিকে তাকাই নাই; আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি, তোমার ত্যাগকে লক্ষ্য করি নাই; কেবল পাবার জন্য ছটফট করেছি, কোনদিন তোমায় সত্যভাবে কিছু দিই নাই। এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝলাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয়; ত্যাগেই শান্তি, ভোগে নয়।... বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি কলংকিনীকে আবার চরণ আশ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজন এর মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী জনম সার্থক করি।"**[৬] অর্থাৎ মৃণাল তার 'ভুল' বুঝতে পেরেছে গল্পের শেষে। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি শেষ হয়েছে মৃণালের প্রবল স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্যের মাধ্যমে। সে দাম্পত্যের অপমান মেনে নিতে নারাজ। তাই প্রয়োজনে সে পৃথক থাকতেও রাজি। স্বামীকে লেখা চিঠি শেষ হয়েছে এভাবে — **তোমাদের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন মৃণাল।"**[৭]

কিন্তু বিপিনচন্দ্রের লেখা 'মৃণালের কথা' গল্পটির সমাপ্তি হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। মৃণাল চিঠিতে লিখেছে — **"তুমি আমায় রাখ বা ছাড়ো, যাই করো না কেন, আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিতা মৃণাল।"**[৮]

অর্থাৎ 'স্ত্রীর পত্রে' যে মৃণাল বিবাহবিচ্ছেদকামী, সেই মৃণালই বিপিনচন্দ্র রচিত 'মৃণালের কথা' গল্পে প্রবলভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল। এভাবে দেখা যায় দুই গল্পের চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকলেও উপস্থাপনের ভিন্নতায় দুটি ভিন্ন ব্যঞ্জনাময় ভিন্ন স্বাদের গল্প হয়ে উঠল। তবে সামগ্রিকভাবে তৎকালীন সাহিত্য-মতাদর্শগত ভিন্নতারই পরিচয়বাহী এই গল্পটি। প্রখ্যাত সমালোচক শিশির কুমার দাস এ বিষয়ে লিখেছেন —

> **'নারায়ণ' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল এই সময় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, ফলে তিনি 'সবুজ পত্রে'র বিরুদ্ধেও লাগলেন... ১৩২১এর শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রে' "স্ত্রীর পত্র" নামে গল্প লেখেন। নিঃসন্দেহে চরিত্র পরিকল্পনায়, আখ্যান বর্ণনায়, তার চেয়েও বড় নারীতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসে এক অগ্রণী ভূমিকায় এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। সম্ভবত সেই কারণেই এই গল্প উত্তেজিত করেছিল রক্ষণশীল শক্তিকে। বিপিনচন্দ্র পাল তার বিরুদ্ধে 'নারায়ণে'র প্রথম সংখ্যাতেই লিখলেন "মৃণালের কথা"। বিপিনচন্দ্র বললেন রবীন্দ্রনাথের মৃণালের ভাষা অস্বাভাবিক। তার নায়িকা তাই অন্যকে আক্রমণ করে বলে 'লেখার খুব বাহাদুরী আছে ঠিক যেন রবি ঠাকুরের মতন।' রক্ষণশীলতার সঙ্গাবদ্ধ চক্রান্ত ছিল চিরাচরিত পুরুষশাসিত পারিবারিক আদর্শকে সমর্থন করা এবং তার বিরোধী শক্তিকে বিনষ্ট করা...।**[৯]

আমরাও শ্রদ্ধেয় সমালোচকের এই মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে পারি, বিপিনচন্দ্রের 'মৃণালের কথা' গল্প রচনার পশ্চাতে একটি প্রবল হিন্দু রক্ষণশীল মানসিকতা বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল। সাহিত্য রচনায় তিনি প্রভাবিত হয়েছেন সামাজিক কল্যাণমুখী চিন্তার দ্বারা। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় তিনি ঔপনিবেশিক প্রভাবকে রুখে দিতে চেয়েছিলেন। তাই গল্পের পরিণতি হয়েছে ভিন্ন।

সব মিলিয়ে প্রবন্ধই হোক বা কথাসাহিত্য — সব ক্ষেত্রেই বিপিনচন্দ্রের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে দেশের কল্যাণ চিন্তা। দেশের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ। সাহিত্য আদর্শের সঙ্গে স্বদেশভাবনার আশ্চর্য মেলবন্ধনের রূপকার বিপিনচন্দ্র পাল বাংলা সাহিত্যে হয়ে উঠেছেন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

তথ্য উৎস ও সূত্রনির্দেশ:

১। 'নূতনে পুরাতনে', বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃষ্ঠা ১।

২। 'সকলি আছে কিছুই নাই', বিপিনচন্দ্র পাল, 'নারায়ণ', আশ্বিন ১৩২৩ পৃষ্ঠা ১১৫৮।

৩। 'সত্তর বৎসর', বিপিনচন্দ্র পাল, পত্রলেখা, ১০ বি কলেজ রো, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৪। 'মৃণালের কথা', বিপিনচন্দ্র পাল, 'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৫২।

৬। ঐ, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৬।

৭। 'স্ত্রীর পত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অখণ্ড গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, ভাদ্র ১৪১৭ সংস্করণ, পৃ. ৫৭৬। (মূল গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায়)।

৮। 'মৃণালের কথা', 'বিপিনচন্দ্র পাল, নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃষ্ঠা ৫৬।

৯। 'বাংলা ছোটগল্প', শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা ২৪৬।

লেখক পরিচিতি:

ড. অপরেশ হালদার: শিক্ষক। বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের প্রাক্তন গবেষক ছাত্র। অনেকানেক প্রবন্ধের রচয়িতা।

—